মৃত্যু, এত অহংকারের কিছু নেই তোমার...

পার্থপ্রতিম মণ্ডল

আর পাঁচজন সৃজনশীল মানুষের চেয়ে কবির মৃত্যু কি আগে আসে? বেশ কয়েকবছর আগের ঘটনা। ক্যালিফর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির লার্নিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ডাইরেক্টর জেমস সি কফম্যান একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ১৯৮৭ জন প্রয়াত লেখকের পরিসংখ্যান দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক এই গবেষক তাঁর পত্রে দেখান— গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার বা অন্যান্য গদ্যলিখিয়েদের চেয়ে কবিদের আয়ু তুলনামূলকভাবে কম। কফম্যানের এই গবেষণা শুধু যে মার্কিনি লেখক লেখিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; চৈনিক, তুর্কি, পূর্ব ইয়োরোপের অনেক লেখক লেখিকাদের কথাও তিনি মাথায় রেখেছিলেন। ২০০৩-এ *ডেথ স্টাডিজ* নামক জার্নাল-এ তাঁর এই পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রটির শিরোনাম ছিল, 'দ্য কস্ট অফ দ্য মিউজ : পোয়েটস ডাই ইয়ং'।

প্রায় একইরকম বিষয় নিয়ে অন্য একখানি বইয়ে (*দ্য প্রাইস অফ গ্রেটনেস : রিসলভিং দ্য ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ম্যাডনেস কন্ট্রোভার্সি*) আরেক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

ইউনিভার্সিটি অফ কেনটাকি মেডিক্যাল সেন্টার-এর সাইকিয়াট্রি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আর্নল্ড এম লুডউইগ, সৃজনশীল-শিল্প জগতের এক হাজার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের উপর পর্যালোচনা চালান এবং অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। লুডউইগ-এর গবেষণায় ধরা পড়ে আরেক উল্লেখযোগ্য তথ্য। অন্যান্য সমস্ত পেশার কর্মীদের মধ্যে গড় আত্মহত্যার হার যেখানে ৪ শতাংশ, কবিদের ক্ষেত্রে তা নাকি ২০ শতাংশ।

মাদকাশক্তি না আর্থিক অনটন, অবসাদ নাকি একাকিত্ব—কবিদের জীবনে দ্রুত নেমে আসা এই অপরাহ্নের পিছনে ঠিক কারণ কোনটি? নানান মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা এই দুই মনস্তত্ত্ববিদ তাদের আলোচনায় দিয়েছেন। তবে সেসব কোনোটাই প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। বরং আমাদের পরিচিত বাস্তবের সঙ্গে সেসবের অসঙ্গতিটাই বেশি চোখে পড়ে।

বস্তুতপক্ষে এরকম একটি বিষয় নিয়ে যে একটি গবেষণাপত্র হতে পারে তা ভাবাটাই আমাদের কাছে একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কাজেই এধরনের একটি তত্ত্বকে আমরা কতখানি গুরুত্ব দেব, বা আদৌ আমাদের এসব আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কিনা এ নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তাছাড়া এমন উদাহরণ তো ভুরি ভুরি যেখানে নামজাদা বহু কবি দিব্যি বেঁচে থেকেছেন জীবনের বার্ধক্যবেলা পর্যন্ত, তাদের সৃজনশীলতাকেও অক্ষত রেখেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এলিয়ট, নেরুদা থেকে রবীন্দ্রনাথ, আরও কত নাম যে এই তালিকায় উঠে আসবে তার ইয়ত্তা নেই।

তবু কখনও কখনও কারো কারো ক্ষেত্রে অন্তত— এবং সেই সংখ্যাটাও নগন্য নয় বোধহয়— এমন একটা ধারণা মনের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া খুবই অস্বাভাবিক কি? কেন কোনো কোনো কবির জীবনে ঠিক যখন তাঁদের সৃজনক্ষমতা তুঙ্গে, ঠিক যখন তারা যাত্রা শুরু করেছেন নির্দিষ্ট কক্ষপথে, মৃত্যু এসে তাঁদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিয়ে গেছে। সিলভিয়া প্লাথ গ্যাস খুলে দিয়ে ওভেন-এ মাথা গুঁজে দিলেন যখন তার বয়স মাত্র তিরিশ, কেন? দুরারোগ্য যক্ষ্মা কেনই বা অকালে স্তব্ধ করে দিয়ে গেল এক এক করে ব্রন্টি পরিবারের তিন বোনেরই জীবন? এসবের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হয়তো হয় না। যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করাও বৃথা। হয়তো তাঁদের প্রতিভার মতোই তাঁদের জীবনও এক মস্ত প্রহেলিকার চাদরে মোড়া। কখনও কখনও তা এক অদ্ভুত সমাপতন বলেও বোধ হয়। মাত্র চার বছরের ব্যবধানে শেলি কিটস বায়রন-এর মতো তিন কবির মৃত্যু ইংরেজি কাব্যের ইতিহাসে গোটা রোমান্টিক যুগটাকেই যেন শূন্য করে দিয়ে যায়। তাঁদের কাব্যের মতোই তাঁদের স্বল্পায়ু জীবনও তাই বহুকাল ধরেই সাহিত্যের ইতিহাসে এক বহুচর্চিত বিষয়।

১৭৯৫ সালের অক্টোবর মাসের ৩১ থেকে ১৮২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, মাত্র পঁচিশ বছরের জীবনে ইংরেজ কবি কিটস যে নিদর্শন রেখে গেছেন মানবেতিহাসে তার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব বলেই মনে হয়। জীবনের এই পঁচিশটি বছরও আবার ছিল জীবনযুদ্ধে কন্টকিত। মাত্র ন'বছর বয়সে বাবার মৃত্যু, মায়ের পুনরায় বিয়ে, মাতামহীর আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা,

বায়রন

কিটস

মায়ের মৃত্যু, কিশোর বয়স থেকে শিক্ষানবিশির কাজ, এরই মধ্যে ভার্জিল-এর *এইনেইড*-এর অনুবাদ। এই সব পার হয়ে নিজেকে যখন সম্পূর্ণ সঁপে দিতে পেরেছেন কাব্যের জগতে অমনি মৃত্যু এসে যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল এই মহৎ প্রাণ। হ্যাঁ, শুধু এক বিরল প্রতিভার কবি নয়, মানুষ হিসেবেও অসামান্য মহত্ত্বের অধিকারী ছিলেন অকালপ্রয়াত এই লেখক। মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে থেকে মাকে সেবা করেছেন, কনিষ্ঠ ভাইয়ের যক্ষ্মায় আক্রান্ত হবার খবর শুনে তার শেষ দিন পর্যন্ত পাশে থেকেছেন, ভেবেও দেখেননি এই সময়ে এই মারণব্যাধি তারও শরীরে প্রবেশ করেছে, যা কিছুদিন পরে ছিনিয়ে নেবে তাঁর নিজের প্রাণও।

কিন্তু শুধুই কি মারণব্যাধি? শুধুই কি সেই দুরারোগ্য যক্ষ্মাই ছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ? আপাতদৃষ্টিতে তাই, তবু অনেকেই বিশ্বাস করেন ব্যর্থ প্রেম এই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৮১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কিটসের সঙ্গে আলাপ হয় ফ্যানি ব্রন-এর। শুরু হয় প্রেম। ফ্যানি ও কিটস পরস্পরের প্রতি বাগদত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু অনেকেই মনে করেন কিটসের প্রতি ফ্যানির আচরণ ছিল নিষ্ঠুর। অবশ্য এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য যে কথাগুলি কিটস সম্পর্কিত এক আলোচনায় একবার বলেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় : 'আমার মনে হয় ফ্যানি ব্রন-এর প্রতি আসক্ত হওয়ার কালে কিটস জানতেন যে তাঁর আয়ু খুব সীমিত, এবং দাম্পত্যজীবন যাপনের সুযোগ তাঁর জুটবে না। তথাপি তাঁর চিত্তে ছিল আশ্চর্য প্রশান্তি, তা যেমন তাঁর কয়েকটি পত্রে দেখা যায় তেমনই

পাওয়া যায় তাঁর 'টু অটম' কবিতায়। ১৮১৮, ১৮১৯ এবং ১৮২০— এই তিনটি বৎসর মানুষ কিটস-এর বহু দুঃখভোগের বৎসর, কিন্তু কবি কিটস-এর শ্রেষ্ঠ রচনার কালও এই তিন বৎসর।...'

মজার ব্যাপার হল, যারা মনে করেন না যে প্রেমে ব্যর্থতাই ছিল কিটসের মৃত্যুর কারণ তারা উল্টোদিকে অন্য আরেক মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি অবমাননাই কিটসের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৮১৮ সালে *কোয়ার্টারলি রিভিউ* আর *ব্ল্যাকউডস ম্যাগাজিন*-এ কিটসের 'এনডিমিয়ন' কবিতাটির নিদারুণ বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সমালোচনার নামে কটূক্তিই ছিল বেশি। এতে তরুণ কবি যথেষ্ট মর্মাহত হয়েছিলেন। এই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করেছেন কবি শেলি স্বয়ং। কিটসের মৃত্যুতে লেখা শোকগাথা 'অ্যাডনেইস'-এ এমনই মত ব্যক্ত করেন শেলি। তাঁর মতে, এ সময় 'হাইপেরিয়ন' নামে দীর্ঘ কাব্যগ্রন্থটি রচনা শুরু করে কিটস যে সেটিকে অসমাপ্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন তার প্রধান কারণও ছিল এটাই। হতাশাগ্রস্ত কিটস কি কাব্যজগৎ থেকেই বিদায় নিতে চেয়েছিলেন?

কিটসকে অসম্ভব ভালোবাসতেন শেলি। কিটসের মারণরোগের খবর যখন তার কাছে পৌঁছয় তখন তাঁকে ইতালিতে আমন্ত্রণ জানান শেলি। শেলির ধারণা ছিল আবহাওয়া বদল হলে কিটস হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবেন। হয়তো তাঁর সঙ্গে কিটসের যন্ত্রণাকে লাঘব করবে। ভীষণ আত্মসচেতন কিটস কিন্তু শেলির আতিথেয়তা গ্রহণ করেননি। ১৮২০ সালে কিটস ইতালি যাত্রা করলেন ঠিকই, পৌঁছলেন রোম শহরে, কিন্তু শেলির কাছে নয়। এক বছরের মাথায় ১৮২১ সালের ফেব্রুয়ারির ২৩ তারিখে রোমেই মৃত্যুবরণ করলেন। রোমেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হল। কিটসের এই সমাধিস্থলটিকে এত পবিত্র মনে হয়েছিল শেলির যে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন মৃত্যু হলে তাঁকেও যেন সমাধিস্থ করা হয় এই স্থলেই। আর এর ঠিক দু'বছর পরেই শেলিরও মৃত্যু হল। শেলির ইচ্ছেকে মেনে সেই স্থলেই তার চিতাভস্ম সমাধিস্থ হয়।

আগেই বলেছি কিটস, বায়রনের মৃত্যু ছিল ইতিহাসের এক অদ্ভুত সমাপতন। জল ভালোবাসতেন শেলি, সেই জলই তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। ভালোবাসতেন শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতির কোলে নৌকোয় চড়ে ভ্রমণ করতে, অথচ সাঁতার জানতেন না। এমনই মানুষ ছিলেন শেলি। অদম্য উৎসাহী, সাহসী, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। নিরীশ্বরবাদী, মানবমুক্তির সংকল্পে বদ্ধপরিকর, অকপট এক কবির কাছে এমনটাই তো আশা করা যায়। অগাস্ট ৪, ১৭৯২ থেকে জুলাই ৮, ১৮২২। মাত্র তিরিশ বছরের অনতিদীর্ঘ জীবনে শেলির বেঁচে থাকাও তো ছিল সেইরকম। তা সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধু টমাস হপ-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'নেসেসিটি অফ এথেইজম' প্রকাশ করাই হোক, তাঁর জীবনে হ্যারিয়েট-কাহিনিই হোক কিংবা আল্পস-এর পর্বতশিখরে একলা তুষারপাতের মধ্যে চলে

শেলি

যাওয়াই হোক। 'নেসেসিটি অফ এথেইজম'-এর জন্যে শেলিকে অক্সফোর্ড থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। আর হ্যারিয়েট কাহিনি তো তাঁর জীবনে সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত অধ্যায়।

হ্যারিয়েটকে ভালোবেসেছিলেন শেলি। প্রথাগত বিবাহবন্ধনে আজীবন অবিশ্বাসী হয়েও হ্যারিয়েটকে বিয়ে করেছিলেন। অথচ সেই বিয়েকেই তার 'হৃদয়হীন মিলন' মনে হয়েছিল একদিন। পরিবারের নির্যাতনের হাত থেকে প্রেমিকা হ্যারিয়েটকে উদ্ধার করেছিলেন শেলি। কিন্তু শেলির দুরন্ত জীবনের সঙ্গিনী হবার ক্ষমতা হ্যারিয়েটের ছিল না। যে শেলি যাচ্ছেন আয়ারল্যান্ডে বিদ্রোহ প্রচার করতে, ওয়েলস-এ মানবকল্যাণের কাজে—তার সঙ্গে কীভাবে প্রথাগত সংসার করবেন হ্যারিয়েট? বরং এই জীবন শেলিকে অনেক বেশি টেনে এনেছিল মেরি গডউইন-এর কাছে। কতখানি প্রথাবিরোধী ছিলেন শেলি তার পরিচয় পাওয়া যায় মেরি গডউইন-এর সাথে তাঁর সম্পর্কের দিকে একটুখানি দৃষ্টিপাত করলেই। উইলিয়ম গডউইন মেরির বাবা নিজে ছিলেন অনেক বিপ্লবী ধ্যানধারণার জনক, তাঁর বিবাহবন্ধনমুক্ত অবাধ সম্পর্কের ওকালতি ছিল সেইসময়ে যথেষ্ট সাড়াজাগানো। অথচ নিজের মেয়ের সঙ্গে শেলির এই প্রেম মেনে নিতে তিনি রাজি হননি। মেরি ও শেলি দুজনকেই তাই নিজের নিজের ঘর থেকে বের হয়ে সহবাস করতে হয়েছে অন্যত্র।

প্রথাবহির্ভূত এই জীবনের জন্যে শেলিকে কম যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়নি। নিন্দে মন্দ তো আছেই, হতাশাগ্রস্ত হ্যারিয়েট নেশাগ্রস্ত হয়ে টেমস নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন, হ্যারিয়েট-এর গর্ভে জাত সন্তানদের অভিভাবকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন

শেলি। এ সবই তাঁর তিরিশ বছরের জীবনকে কুরে কুরে খেয়েছে। তবে বিবাহের শৃঙ্খল বা বন্ধনে কোনদিনই বিশ্বাস করেননি শেলি। সে কথা তাঁর কবিতাতেও তিনি বারেবারে স্পষ্ট করে গেছেন। *কুইন ম্যাব, এপিসাইকিডিয়ান*-এর মতো কাব্যগ্রন্থেও এ কথা তিনি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন।

মজার ব্যাপার এই 'কুইন ম্যাব' কাব্যখানি শেলি উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন হ্যারিয়েটকেই। সেই 'কুইন ম্যাব' যার শীর্ষলেখে শেলি উদ্ধৃত করেছেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে ভলত্যের-এর বিখ্যাত উক্তি 'ভেঙে ফেল ওই কুখ্যাতটাকে' (এক্রাজে লঁফাম), আর আর্কিমেডিসের বিখ্যাত সেই কথা : 'বিশ্বের বাইরে দাঁড়াবার মতো একটু স্থান দাও আমি বিশ্বকে চালনা করতে পারব।'

১৮২২ সালের ৮ জুলাই বন্ধু এডওয়ার্ড উইলিয়মস ও আরেক নাবিকের সঙ্গে শেলি তার প্রিয় তরী 'ডন জুয়ান' ভাসিয়ে দিয়েছিলেন স্পেৎসিয়া শহরের কাছে সমুদ্রকূলে। ঘণ্টা দুয়েক যেতে না যেতেই প্রবল ঘূর্ণি ঝড়ের মুখে পড়ে ডন জুয়ান। ভেঙে ছারখার হয়ে যায় সবকিছু। সমুদ্র ফিরিয়ে দেয় কবি ও তাঁর বন্ধুকে। ঘটনার আট দিন পর তীরে ভেসে ওঠে তিনজনের গলিত শবদেহ। ইতালিতে তখন প্রবল প্লেগের আশঙ্কা। শেলির শবদেহ দাহ করার সিদ্ধান্ত হয়। শেষকৃত্যে পাশে ছিলেন বন্ধু বায়রন ও লি হান্ট। ভাবা যায় এই লি হান্ট-এর সঙ্গেই শেলির কথা ছিল একখানি পত্রিকা প্রকাশ করার! কবির কথা মতো তাঁর চিতাভস্ম সমাধিস্থ করা হয়েছিল কিটসের সমাধির পাশেই। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এই মৃত্যু কি ছিল নিছকই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা? নাকি আরো কিছু? আত্মহত্যা? শেলির মৃত্যু আজও অনেকের কাছে রহস্যে মোড়া।

আর বায়রন? বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন তাঁকে যে কীভাবে ঠেলে দিয়েছিল এক অস্বাভাবিক পরিণতির দিকে সে কাহিনি বলা হয়েছে কত না কত ভাবে। ১৮১৬ সালে চিরতরে ইংল্যান্ড ছাড়েন বায়রন। সুইজারল্যান্ড-এ জেনেভায় চলে আসেন। আর এখানেই মুখোমুখি হন দুই কবি, শেলি ও বায়রন। মেরি গডউইন ও তাঁর তুতো বোন ক্লেয়ার ক্লেয়ারমন্টকে সঙ্গে নিয়ে শেলিও তখন জেনেভাবাসী। নারী হৃদয় জয়ে পারদর্শী বায়রনের সঙ্গে সহজেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে ক্লেয়ার ক্লেয়ারমন্ট-এর। দুজনে বিয়ে করেন। এক কন্যা ক্ল্যারা আলেগ্রার জন্ম হয়। কিন্তু নারী-সংসর্গের ব্যাপারে বায়রনের উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল সর্বজনবিদিত। নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত। ক্লেয়ারমন্টকে ছেড়ে সহজেই অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হন বায়রন। জীবনে যে কত নারীর সংস্পর্শে এসেছেন বায়রন। কাউকেই তেমন করে ভালোবাসেননি। রাত্রিযাপন করেছেন যে সব নারীর সাথে তাদের এক তালিকা পেশ করে একবার এক বন্ধুকে তিনি লিখছেন : '...some of them are countesses, some of them cobblers' wives, some noble, some middling, some low and all whores.'।

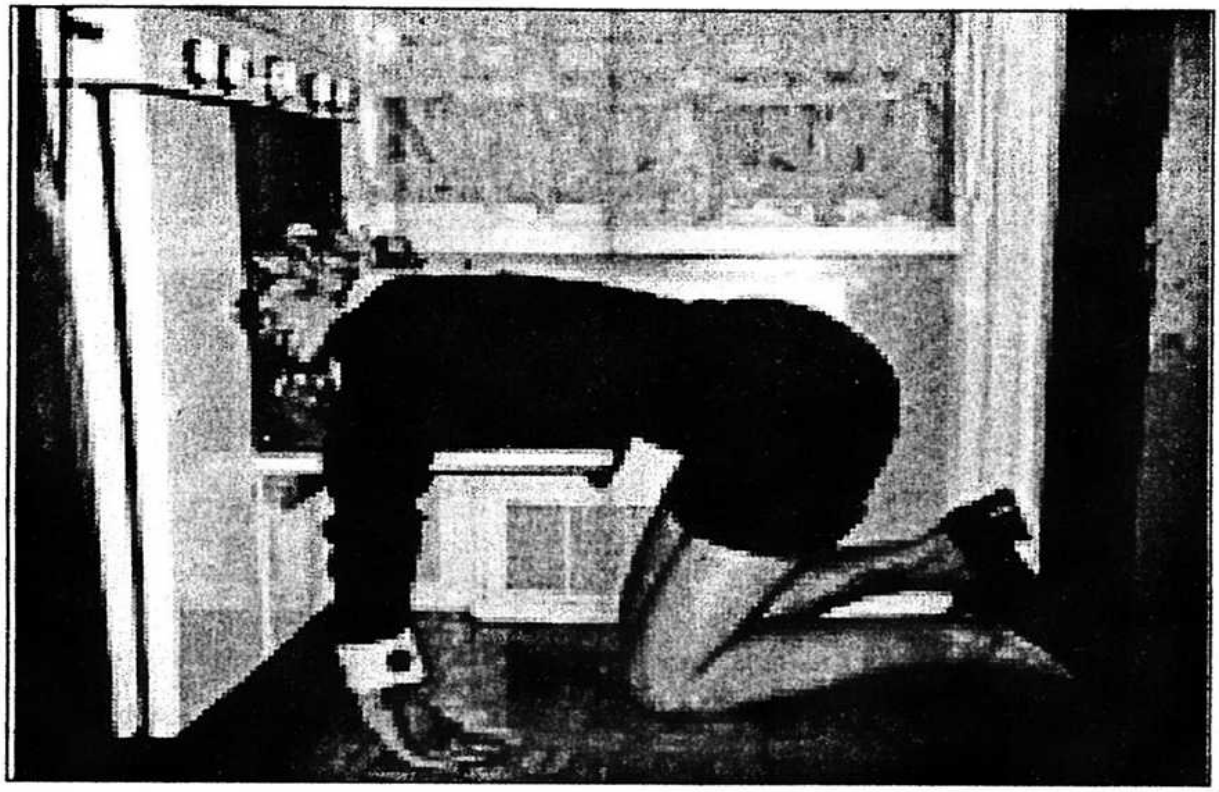

আন্তর্জালের সৌজন্যে সিলভিয়া প্লাথ

বায়রনের নিষ্ঠুরতা যে শুধু তার প্রেমিকাদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, নিজের মেয়ের জীবনকেও তা শেষ করে দিয়েছিল। আলেগ্রাকে ক্লেয়ার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বায়রনের কাছে, যাতে করে মেয়ের ভবিষ্যৎ কিছুটা সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু বায়রন তাকে রেখে আসেন এক কনভেন্ট-এ। সেখানে মায়ের সাথে দেখা করাও তার নিষেধ ছিল। পাঁচ বছর বয়সে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আলেগ্রার মৃত্যু হয়। হয়তো মারা গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল মেয়েটি।

ওই বছরই অক্টোবর মাসে জন হবহাউসের সঙ্গে বায়রন ইতালির উদ্দেশে রওনা হন। যাত্রাপথেও তাঁর ব্যাভিচারী জীবনযাত্রার কোনও ব্যতিক্রম হয় না। এইসব ব্যাভিচারের কাহিনি তিনি অকপটে লিখে গেছেন তার সুবিখ্যাত কাব্য *ডন জুয়ান*-এ।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবির চিত্ত যেন কিছুটা হলেও অন্যপথে ঘুরছিল। ১৮২৩ সালে *ডন জুয়ান* সমাপ্ত করে বায়রন গ্রিস-এর উদ্দেশে পাড়ি দেন, সেখানে সেইসময় অটোম্যান শাসনের বিরুদ্ধে চলতে থাকা বিপ্লবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। গ্রিস দেশ সম্পর্কে বায়রনের চিরকালই একটা মোহ ছিল। আর এই গ্রিস দেশেই ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে মারণ-জ্বরে আক্রান্ত হলেন বায়রন। ডাক্তাররা তার গোটা শরীরে জোঁক ছেড়ে দিয়েছিল দূষিত রক্ত বের করে ফেলার জন্যে। কিন্তু এতে অবস্থার আরও অবনতি হয়। দশদিন পর ১৮২৪-এর ১৯ এপ্রিল ছত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু ঘনিয়ে এল কবির জীবনে।

ইংল্যান্ড-এ কবির দেহ নিয়ে এলে পুরোহিতরা তাকে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে সমাধিস্থ করতে অস্বীকার করেন। বিখ্যাত কারো মৃত্যুতে তখন এটাই রীতি ছিল। বায়রনকে

অগত্যা সমাধিস্থ করা হয় নিউস্টেডে তাদের পারিবারিক কবর স্থানে। অনেক পরে ১৯৬৯ সালে তাঁর নামে অবশ্য একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয় ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে। শোনা যায় শেষকৃত্য চলার সময় বন্ধুরা নাকি বায়রনের একটি ডায়েরি খুঁজে পেয়েছিলেন। কবির জীবনের আরও অনেক ঘটনার গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যে তারা নাকি ডায়েরিটি নষ্ট করে দেন। কী ভুলটাই না করেছিলেন তাঁর এই বন্ধুরা! ভাবা যায় এমন এক কবির শেষ স্বীকারোক্তিটি হয়তো মিলে যেত এই ডায়েরিখানি হাতে পেলে! এমন এক কবি যিনি লিখেছিলেন ; 'I have a conscience, although the world gives me no credit for it; I am now repenting, not of the few sins I have committed, but of the many I have not committed.'

বায়রন-শেলি-কিটস-এর মতো আর এক কবির জীবনেও আমরা এভাবে প্রতিভার স্ফুরণ দেখেছিলাম মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে ফেলার ঠিক আগের মুহূর্তে। তিনি আমেরিকার কবি সিলভিয়া প্লাথ। তাঁর আলোচনা এখানে খুব সংগত কারণেই উঠে আসে। স্কুলের গণ্ডি পার হতে না হতেই কী করে যে তিনি মনের এক গভীর গভীরতর অসুখের শিকার হয়ে পড়লেন। এমন এক অসুখ যা অচিরেই ডেকে আনল অকালমৃত্যুকে। ১৯৫৮-র ২০ জুন এক জার্নালে লিখছেন প্লাথ : 'It is as if my life were magically run by two electric currents : joyous positive and despairing negative–whichever is running at the moment dominates my life, floods it.'। বলার অপেক্ষা রাখে না এক কুৎসিত বাইপোলার ডিসঅর্ডার গ্রাস করেছিল তাঁকে সেই বয়সেই। এমন এক ম্যানিক ডিপ্রেসন যার কোনো সুচিকিৎসা সে সময় ছিল না। ১৯৫৩, মাত্র উনিশ বছর বয়স তখন, ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেন প্লাথ। প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হল, কিন্তু তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ডাক্তাররা ইলেকট্রো-শক থেরাপি করে বাড়ি পাঠালেন। এই সব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বিধৃত আছে তাঁর একমাত্র প্রকাশিত উপন্যাস, *দ্য বেল জার*-এ।

সংকট কাটিয়ে উঠে প্লাথ ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে এলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর এখানেই পরিচয় হল কবি টেড হিউস-এর সঙ্গে। ১৯৫৬-তে বিয়ে। এই বিয়ের পরিণতি কী হয়েছিল সে কথা সকলের জানা, যথেষ্ট আলোচনার বিষয়ও। ১৯৬২তে টেড হিউস প্লাথকে ছেড়ে চলে গেলেন তার নতুন ভলোবাসার পাত্রী আসিয়া গাটমান উইভিল-এর কাছে। এক চূড়ান্ত বিষণ্ণতা প্লাথকে পেয়ে বসে। এই সময়ই রচিত হয় তাঁর সুবিখ্যাত *এরিয়েল*-এর কবিতাগুলি। দুই সন্তানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের ওপর, লেখালেখি করেন ভোর চারটেয় উঠে। অথচ কী অদ্ভুত এক সৃজনশক্তির বিকাশ ঘটে যায় তাঁর মধ্যে এই সময়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই লেখাগুলি তাঁকে অমরত্ব দেবে। এক চিঠিতে মাকে লিখছেন প্লাথ : 'I am writing the best poems of my life.

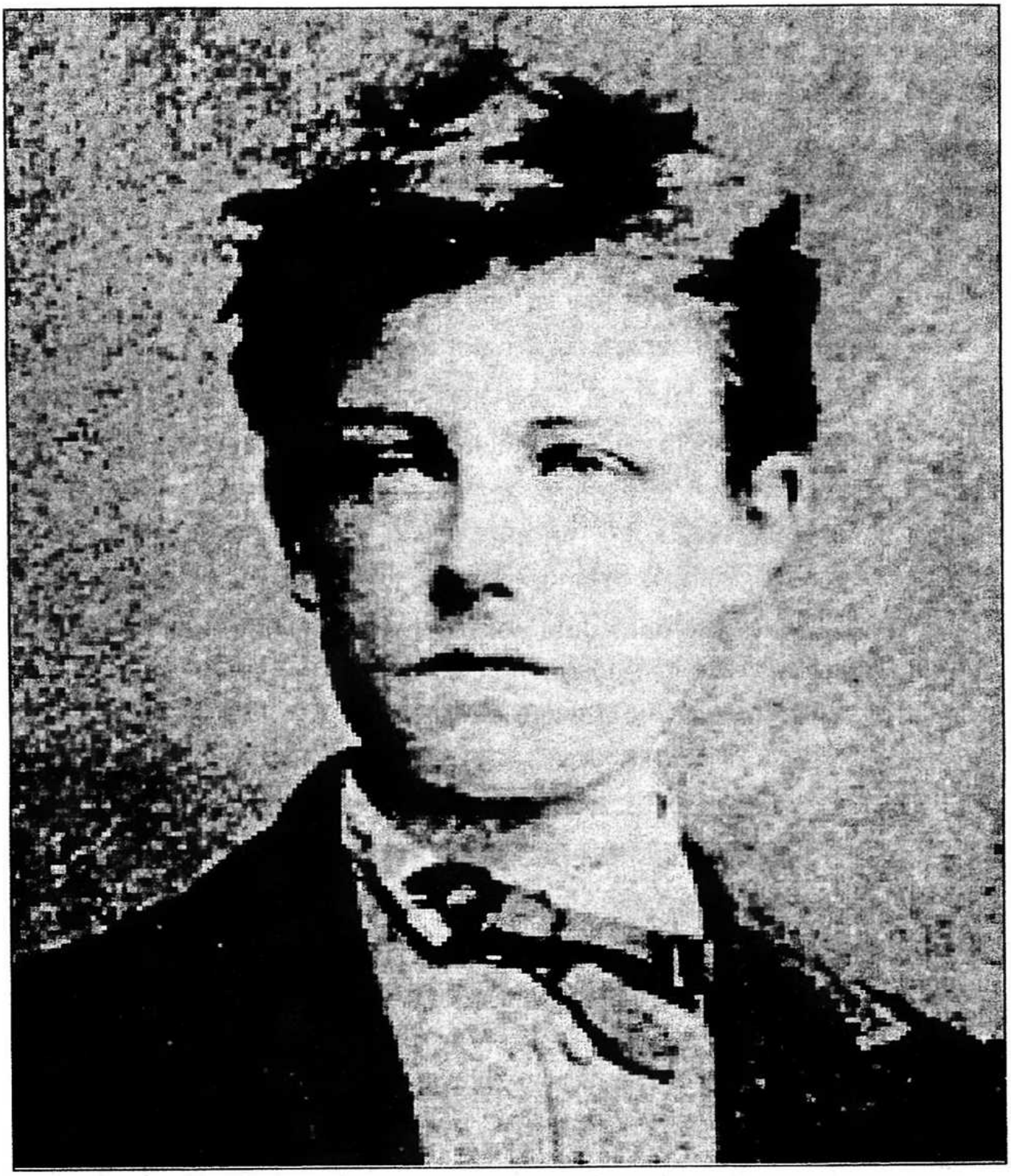

র‍্যাঁবো (১৮৫৪–১৮৯১)

They will make my name.'। আর তার পরই মৃত্যু। রান্না ঘরে গ্যাস ওভেনে মুখ গুঁজে গ্যাস খুলে দিয়ে নিজের দুর্বিসহ জীবনকে এবার সত্যি সত্যি শেষ করে দিলেন সিলভিয়া প্লাথ। আত্মহত্যার আগে দরজা জানালার ফাঁকফোকড় ভিজে টাওয়েল দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড পাশের ঘরে চলে না যায়, যে ঘরে ঘুমন্ত রয়েছে তাঁর দুই শিশু।

এরিয়েল প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর, টেড হিউস-এর সম্পাদনায়। কবিতা ও নিজের মৃত্যু যে আক্ষরিক অর্থে কারো জীবনে এত অভিন্ন হতে পারে তা সিলভিয়া প্লাথের দৃষ্টান্ত ছাড়া বোঝার উপায় নেই। যেন এক মৃত্যুর মধ্যে বেঁচে থেকেছেন কবি, তাঁর কবিতাগুলির উৎসমুখ সেখানেই। অদ্ভুত সব পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে কল্পনা করেছেন। নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা বলেছেন এমনভাবে যেন তিনি বন্দি সেখানে। এইভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক ট্র্যাজেডির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে যেন বা দেখাতে চেয়েছেন, এইসব ঘটনা কিছু না, অন্ধকার মানবমনেরই এক একটি মেটাফর।

সিলভিয়া প্লাথ সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলে থাকেন। অনেকে বলেন, *দ্য বেল জার* বা *এরিয়েল*-এর যে প্রতিক্রিয়া পাঠকমহলে লক্ষ করা যায় তা অনেকটাই তিরিশ বছরে ওই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে। নারীবাদীরা আবার বিশ্বাস করেন, যে বিষণ্ণতা সিলভিয়াকে আশৈশব গ্রাস করেছিল তা সবই এক কর্তৃত্ববাদী পিতা (পাঠকদের মনে পড়বে তাঁর 'ড্যাডি' কবিতাটি), এক বিশ্বাসঘাতক স্বামী, প্রতিভা ও মাতৃত্বের সংঘাত-এর কারণে। আবার কেউ কেউ মনে করেন এসব কোনোটাই ঠিক নয়। প্লাথের ক্ষেত্রে কবিতা ও মৃত্যু ছিল সমার্থক। 'The one could not exist without the other. And this is right. In a curious way, the poems read as though they were written post-humously.' (A. Alvarez/The Savage God.)।

সিলভিয়া প্লাথের ক্ষেত্রে যে কথা ওঠে অকালপ্রয়াত আর এক কবি র‍্যাঁবো সম্পর্কেও সেই এক কথা ওঠে না কি? তাঁর কবিতা না যতটা লোকে বোঝে তার চেয়ে তার ওই সমাজবিরুদ্ধ, প্রথাবিরুদ্ধ, সময়বিরুদ্ধ জীবনধারণই মানুষকে বেশি টানে না কি? কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে কবিতার চেয়েও জীবনটাই বড় হয়ে ওঠে। কী বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এই কিশোর কবি! ছাত্রাবস্থাতেই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন মাস্টারমশাইরা। 'মেধা, ঠিক যতখানি চাও ততটাই, কিন্তু ওর ওই চোখদুটো আর ওই হাসি আমার একটুও ভালো ঠেকে না। ছেলেটা খারাপ কিছু একটা ঘটাবে। আর যাই হোক ওই মাথা থেকে গতানুগতিক কিছু জন্মাবে না। ও একটা জিনিয়াস — হয় ভালো কিছুর, নয়তো চূড়ান্ত মন্দের'— (পেরেত)।

হ্যাঁ, মেধার পরিচয় যেমন পাওয়া গিয়েছিল, তেমনই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বোহেমিয়ান জীবনের। কতবার যে বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। একবার পারি, তারপর ব্রুসেলস, আবার পারি। ট্রেনের টিকিট বৈধ নয়, ধরা পড়ে জেলে গিয়েছেন — কখনও কপর্দকশূন্য হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন ভবঘুরের মতো। র‍্যাঁবো ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ফরাসি সাহিত্যের 'অফঁ তেরিবল্'। মদ, অ্যাবসিন্থ, বেপরোয়া অ্যানার্কিতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। আবার 'পারি কমিউন'-এ সাময়িকভাবে হলেও গিয়ে যোগ দিয়েছেন। রচিত হয়েছে 'ল্যরজি পারিসিয়েন'-এর মতো কবিতা।

আর পল ভের্লেন-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কাহিনি? সাহিত্যের জগতে এ যাবৎ যত স্ক্যান্ডেল বাতাসে উড়ে বেড়ায় এর চেয়ে রোমহর্ষক বোধহয় আর কোনোটাই না। ধনী, রক্ষণশীল মাতিল্দ আর ভের্লেন-এর জীবনে আঁর্তুর র‍্যাঁবোর এসে পড়া যেন এক বিধ্বংসী কালবৈশাখীর মতো। দুই কবির জীবনকে তা লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে, লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে তৎকালীন ইয়োরোপিয় সমাজের যাবতীয় মূল্যবোধকেও। স্বামীর সঙ্গে তরুণ র‍্যাঁবোর সমকামী সম্পর্কের জেরে মাতিল্দকে দূরে সরে যেতে হয়েছে পুত্রসন্তানকে নিয়ে। স্ত্রীর কাছে ফিরে আসতে চেয়েও র‍্যাঁবোর সংসর্গকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি ভের্লেন। এমনকী ব্রুসেলস যাওয়ার পথে স্ত্রী পুত্রকে স্টেশনে ফেলে রেখে তরুণ সঙ্গীর সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। পরবর্তী সময়ে স্ত্রীর কাছে আইনি পরাজয়, নিজের খ্যাতির জলাঞ্জলি যাওয়া, একের পর এক ঘটনা তাকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন শেষ হয়ে যাচ্ছে সব কিছু, তবু যেন কিছুই করার নেই। একসময় গুলি করে হত্যা করতে চেয়েছেন র‍্যাঁবোকে। গুরুতর অবস্থায় র‍্যাঁবোকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কারাদণ্ড হয়েছে ভের্লেন-এর। এইসবের মধ্যেই আবার লেখা হয়ে চলেছে ভের্লেন-এর 'রোমঁস সাঁ পারোল, র‍্যাঁবোর 'ইলুমিনাসিয়ঁ, 'ইউন সেজঁ অনফর'-এর মতো অনবদ্য সব সৃষ্টি, গোটা সিম্বলিস্ট মুভমেন্টটাকেই যা সংজ্ঞাদান করেছে। মাত্র একুশ বছর বয়সে কবিতা ছেড়ে দিয়েছেন র‍্যাঁবো। আর 'কবি' র‍্যাঁবোর মৃত্যু হয়েছে তখনই। স্রষ্টার অলৌকিক অস্তিত্ব তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। যদিও তার পরেও আরও ষোলটি বছর বেঁচে থেকেছেন র‍্যাঁবো। সেই বেঁচে থাকাও কী অদ্ভুতরকমের! অদ্ভুত সব পেশার পিছনে ছুটে বেড়িয়েছেন অর্থোপার্জনের উদ্দেশে। কখনও ওলন্দাজ সেনাবিভাগের সৈনিক, সেখান থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গোপনে পালিয়ে এসে কখনও কনস্ট্রাকশন কোম্পানির ফোরম্যান, কখনও কফি কিংবা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারী — কবিতার জগত থেকে লক্ষ লক্ষ যোজন ক্রোশ দূরে। এ দেশ ও দেশ করে বেড়িয়েছেন, তাও পায়ে হেঁটে। তারপর মৃত্যু এসেছে। সেই ৩৭ বছর বয়সে যখন হাড়ের ক্যান্সারে মৃত্যুশয্যায় তখন তার পাশে শুধু বোন ইজাবেল।

১৮৭১-এর মে-তে লেখা এক চিঠিতে র‍্যাঁবো জানিয়েছেন কখন এক মানুষকে আমরা কবি বলব : 'আমার কথা হল, তাকে হয়ে উঠতে হবে একজন দ্রষ্টা, নিজেকে করে তুলতে হবে একজন দ্রষ্টা। কবি নিজেকে এই দ্রষ্টা হিসেবে গড়ে তোলে তার যাবতীয় সংবেদনকে ওলটপালট করে দিয়ে—সুদীর্ঘ সময় ধরে, তার প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে, যাকে বলে একেবারে যুক্তি ধরে ধরে। যাবতীয় ভালোবাসা, যাবতীয় যন্ত্রণা, যাবতীয় পাগলামি সবকিছুকে; সে নিজেকে খোঁজে, নিজের ভেতরকার সমস্ত বিষকে আত্মসাৎ করে নিয়ে, শুধু রেখে দেয় সেসবের বিশুদ্ধ সারাংশটুকু। এটা একটা ভয়ানক আত্মপীড়ন যখন তাঁর প্রয়োজন হয় তার সমস্ত বিশ্বাস আর তার অতিমানবিক শক্তি, এবং যখন সে

হয়ে ওঠে মস্ত রোগী, মস্ত ক্রিমিন্যাল, মস্ত পাপী — আর মস্ত প্রজ্ঞাবানও! — মানুষের পৃথিবীতে। — কেননা সে পৌঁছে যায় অজ্ঞাত-র জগতে।'

এই ছিলেন র‍্যাঁবো। কাব্যের দুনিয়ায় অকালপ্রয়াণের সংখ্যা কম নয়। ১৮৯৩ থেকে ১৯১৮, ২৫ বছর বয়সে নিহত হয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কবি উইলফ্রেড আওয়েন। আর সাতদিন বেঁচে থাকতে পারলে এই মর্মান্তিক মৃত্যুকে এড়ানো যেতে পারত। আওয়েনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ঘোষণা হয়েছিল যুদ্ধবিরতি। যুদ্ধ নিয়ে হাতেগোনা যে কটি কবিতার জন্যে তিনি আজও বেঁচে আছেন আমাদের কাছে, সে সবকটি কবিতা লেখা হয়েছিল মাত্র পনের মাস সময়ে। সত্যি ভাবা যায় না! প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয়—যে উথালপাথাল সময়ের ভেতর দিয়ে গেছে বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপ তথা গোটা বিশ্ব তাতে এমন আরও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। আটত্রিশ বছর বয়সে লোরকার ভয়াবহ মৃত্যুর কথাও ভুলে থাকা যায় কী করে? তবু কোনো কোনো মৃত্যু যেন সব মৃত্যুর মাঝেও স্বতন্ত্র, তারা যেন আমাদের একটু অন্যরকম ভাবে বিস্মিত করে। এক অদৃশ্য মৃত্যুর উপস্থিতি, সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। মৃত্যুর তিন বছর আগে কিটস লিখছেন :

'When I have fears that I may cease to be / Before my pen has gleaned my teeming brain...'

কেন এই মৃত্যু সচেতনতা? এর জন্যেই কি র‍্যাঁবো কবিকে করে তুলতে চেয়েছিলেন একজন দ্রষ্টা? ⓶